নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৬, পৃ : ৩৭-৬৫
©২০০১ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শ্রেণীভেদে অভিবাসন: প্রেক্ষিত নদীভাঙ্গন

রুমেল হালদার*
গিয়াসউদ্দিন বুলবুল**

ভূমিকা

বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ হিসাবে নদী ভাঙ্গন সমাজ ব্যবস্থায় যেমন প্রভাব বিস্তার করে তেমনি সামাজিক সম্পর্ক, ক্ষমতা কাঠামোতে আনে পরিবর্তন। ভাঙ্গন কবলিত মানুষ ভিন্ন ভাবে নদী ভাঙ্গনের প্রতি সাড়া প্রদান করে। তবে শ্রেণী, লিঙ্গ, বয়স অনুসারে এই প্রাকৃতিক প্রপঞ্চতে মানুষের সাড়া দেয়ার ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অভিবাসন নদী ভাঙ্গনের অন্যতম একটি সাড়া। মূলতঃ অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্যেই নদী ভাঙ্গনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নদী ভাঙ্গনের ফলে গৃহহারা মানুষ প্রথমেই, নতুন একটি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করে এবং নিজেদের সুবিধাজনক স্থানে বাসস্থান গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু সব সময়ই মানুষ তাদের কাঙ্খিত স্থানটিতে অভিবাসন করতে পারে না। এই না করার পেছনে কাজ করে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, স্থানীয় প্রশাসনিক চাপ ও পেশাগত অবস্থান। শ্রেণী কাঠামোয় উচচতর অবস্থানের কারণে একটি পরিবার যেভাবে বা যে স্থানে অভিবাসন করে, দরিদ্র শ্রেণীর একটি পরিবারের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। আবার, অভিবাসনের মূল কারণ (নদী ভাঙ্গন) অভিন্ন থাকলেও নতুন বাসস্থান, এলাকা বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও শ্রেণী ভেদে ভিন্নতা দেখা যায়। আবার একই শ্রেণীর মধ্যেও এক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে পার্থক্য দেখা দেয়, তেমনি পাশাপাশি দুটি ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে লিঙ্গীয় পার্থক্যও স্পষ্ট। অভিবাসন প্রক্রিয়ায় উল্লেখিত বিষয়াবলী এই প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রবন্ধটি প্রবন্ধকারদের সাম্প্রতিক গবেষণার একটি অংশ। গবেষণা কর্মটি মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার ভেলাবাধ ও কাষ্ঠাপাড়া গ্রামের পঞ্চাশটি

---

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
** এম ফিল শিক্ষার্থী, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

গৃহস্থালীর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। তবে তথ্য সংগ্রহের জন্য শুধু মাত্র প্রথাগত ভাবে গৃহস্থালী প্রধানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি, গুরুত্ব সহকারে নারী ও কিশোর কিশোরীদেরকেও সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিভিন্ন ধরনের সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবার তথা সমাজে তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ থাকে। গবেষণা কর্মটি ভেলাবাদ গ্রামে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বসবাস করছে কিন্তু নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়েছেন এমন গৃহস্থালী এবং কাণ্ঠাপাড়া গ্রামের রাস্তায়, যারা বিভিন্ন স্থান থেকে এসে বসবাস করছেন তাদের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে প্রধানত গৃহস্থালী জরিপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, দলীয় আলোচনা, ঘটনা নিরীক্ষণ, জীবন ইতিহাস, মৌখিক উৎস, মাধ্যমিক উৎস ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। মাঠকর্মের পাশাপাশি ইতিমধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ; পত্র পত্রিকা এবং গবেষকদের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। নদী ভাঙ্গন ও মানুষের সাড়া বিষয়ক এই গবেষণায় যে মূল জিজ্ঞাসাগুলো চিহ্নিত করা হয় তা নিম্নরূপ:

- নদী ভাঙ্গনে বয়স, লিঙ্গ ও শ্রেণীভেদে সাড়া দেওয়ার ধরণ ও পার্থক্য অনুধাবন।
- নদী ভাঙ্গনে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও লৌকিক আচার বিশ্লেষণ।
- অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন শ্রেণী সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ।
- দূর্যোগ হিসেবে নদী ভাঙ্গন সম্পর্কে স্থানীয়দের প্রত্যয়ন তুলে ধরা।

তবে এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে নদী ভাঙ্গন কালীন ও পরবর্তী সময়ে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় শ্রেণীভেদে মানুষের সাড়া দেওয়ার বিভিন্ন দিক আলোচিত হবে।

এই গবেষণায় সুনির্দিষ্ট কোন তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসরণ করা হয়নি। তবে William Torry'র তত্ত্ব দ্বারা গবেষণাটি প্রভাবিত হয়েছে। দূর্যোগের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক প্রপঞ্চগুলির সাথে টিকে থাকার সংগ্রামে কীভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অবতীর্ণ হচেছ, তার উপর Torry (1979) গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিজস্ব পন্থায় ভিন্ন ভিন্নভাবে দূর্যোগ প্রতিরোধ করেছে। দূর্যোগ বিষয়ে perception, তাকে চিহ্নিতকরণ কিংবা তার সাথে অভিযোজনের ক্ষেত্রে নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। Aboriginal condition এর পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে দূর্যোগ মোকাবেলার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন Torry, দূর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব এই পন্থাকে তিনি Homeostatically Defined System হিসাবে চিহ্নিত করে বলেন,

আন্তঃ জাতিগত অর্থনৈতিক বিনিময়, স্থান ত্যাগ, সামাজিক ক্রিয়ার হ্রাসকরণ বা নিয়মিতকরণ, আন্তঃ জাতিগত আক্রমণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী দূর্যোগের সাথে অভিযোজনের চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দূর্যোগ মোকাবেলার বা দূর্যোগের ফলে উদ্ভুত বিভিন্ন প্রপঞ্চের সাথে মিথক্রিয়ার বহুত্ববাদী ধারণাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। Homeostatic approach-এ দেখা যায়, বিভিন্ন Horticultural tribe দূর্যোগের সমসয় বাসস্থান হতে ছড়িয়ে পড়ে অর্থনৈতিক ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করে। যার ফলে সামাজিক পরিবর্তন দেখা দেয়, এবং এই সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম নির্দেশক হচেছ অভিবাসন। আবার কখনো দূর্যোগকে মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠী পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও স্থিতি বজায় রাখে। আবার কোন কোন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়া, প্রথা, উৎসব ইত্যাদির হ্রাসকরণের মাধ্যমে দূর্যোগে টিকে থাকার চেষ্টা করে। কখনো আবার তারা প্রার্থনা, যাদুবিদ্যা ইত্যাদি প্রথার নিয়মিত করণের দিকে এগিয়ে যায়। কখনো দূর্যোগের সময় আন্তঃ-জাতিগত আক্রমণ ও যুদ্ধ বৃদ্ধি পায়। এভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে বা নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় দূর্যোগের সাথে অভিযোজনের চেষ্টা করে। Homeostatic approach-এ দূর্যোগ মোকাবেলার এই বহুত্ববাদী ধারনাগুলিকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই গবেষণা কর্মটিতে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিয়েছি এবং একটি জনগোষ্ঠী দূর্যোগ বিষয়ে কী ভাবছে এবং তার সাথে মিথস্ক্রিয়ার ধরণগুলি কী কী তা দেখার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ দূর্যোগের প্রতি সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পদ্ধতিগুলিকে অনুসন্ধানই ছিল গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

অভিবাসনের ধরন

পদ্মা নদী যখন ভাঙ্গতে শুরু করে, তখন ভাঙ্গন কবলিত এলাকা ছেড়ে দ্রুত নিরাপদ কোন আশ্রয়ে চলে যাওয়া অত্যাবশ্যকীয় হলেও নদী পাড়ের মানুষ খুব সহজে নিজেদের এলাকা ছাড়তে চায় না। ক্রমাগত ভাঙ্গনে নদী যখন গৃহের ১০/১৫ হাত দূরত্বের মধ্যে চলে আসে, তখন তারা পিতৃ-পুরুষের ভিটা-মাটি ত্যাগ করে অন্য কোন স্থানে বসতি গড়ে তোলে। কখনো কাছেই কোথাও আশ্রয় খোঁজে বা দূরবর্তী স্থানে চলে যায়। আবার কখনো এলাকা ছেড়ে স্থায়ী ভাবে অন্য জেলায় অভিবাসন করে। এই অভিবাসন প্রক্রিয়া কখনো এককভাবে, কখনো যৌথভাবে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে কখনো পরিবারকে সাথে নিয়ে, কখনো আত্মীয়দের বা

প্রতিবেশীদের সাথে নিয়ে অভিবাসন সম্পন্ন হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজ করে নিজ নিজ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং লিঙ্গীয় অবস্থান। গবেষিতদের মাঝে একক ও যৌথ দুই ধরনের অধিবাসনই দেখা গেছে। তবে দরিদ্রদের মাঝেই যৌথ অধিবাসন বেশী। উচচ শ্রেণী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন যৌথভাবে অভিবাসন করেছে কম। তাদের মাঝে একক অভিবাসন বেশী দেখা যায়। উচচ এবং নিম্নশ্রেণী নিজেদের এলাকাতেই অভিবাসনে আগ্রহী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা স্থায়ীভাবে দূরবর্তী অঞ্চলে চলে যায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে পদ্মা পাড়ের আশেপাশে নিজেদের এলাকাতে অভিবাসন খুব কম লক্ষ করা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অভিবাসন করে পদ্মা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে চলে যায়। প্রতিটি শ্রেণীর ক্ষেত্রেই অভিবাসনের পেছনে ক্ষমতা, অর্থ, সম্মান, জ্ঞাতিসম্পর্ক, পেশা, নির্বাচন, বস্তুগত স্বার্থ ইত্যাদি কাজ করে। এর ফলে তাদের মাঝে অভিবাসনের ধরনেও ভিন্নতা দেখা দেয়।

অভিবাসনের এলাকা নির্ধারণ

ভাঙ্গন পূর্ববর্তী সময়ে এবং ভাঙ্গনকালীন সময়ে ধনীদের কাছে নগদ অর্থের যোগান থাকে - এমনটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। উচচ শ্রেণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভাঙ্গতে থাকা বসতবাড়ীর গাছপালা বিক্রি করেও তারা নগদ অর্থ পায়। গাছ বিক্রির পাশাপাশি কখনও কখনও অতিরিক্ত দুই একটি টিনের ঘরও তারা বিক্রি করে। যা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক কম। তবে আর্থিক দৃঢ়তা নদী ভাঙ্গনকালীন সময়ে বড় সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। ফলে কাছাকাছি যে কোন জায়গায় জমি কিনে সেখানে বাসস্থান তৈরী করা উচচ শ্রেণীর জন্য সহজতর হয়। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে নিম্নশ্রেণী সব সময়ই দূর্বল থাকে। ভাঙ্গনকালীন জরুরী সময়ের জন্য কোন সঞ্চয় তাদের থাকে না। এমনকি বিক্রি করার মতো কোন সম্পদও তারা খুঁজে পায় না। গহনা বা মূল্যবান বাসনপত্রের মতো কোন সম্পদ তাদের থাকে না বা থাকলেও অতি সামান্য এই সম্পদ বিক্রির প্রতি তারা আগ্রহী হয় না। অর্থনৈতিক দৃঢ়তা না থাকায় অভিবাসনের জন্য নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলকে তারা অভিবাসনের জন্য বেছে নিতে পারে না। যেখানে তারা জায়গা পায় (সেটা সরকারী জমি, স্কুল, মাঠ, রাস্তা কিংবা বাঁধ যাই হোক না কেন) সেখানেই তাদের ঘর তুলতে হয় নতুন করে। তাছাড়া শুধুমাত্র কৃষি জমির উপর নির্ভরশীলতা তাদের আরো প্রান্তিক করে তোলে। কারণ পদ্মার ভাঙ্গনের ফলে ভিটেমাটিসহ সমস্ত কৃষি জমি যখন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তখন তারা উৎপাদনের একামাত্র উপায় হতেই উৎখাত হয়। এই প্রক্রিয়ায় তাদের অর্থনৈতিক শক্তি শূণ্যে নেমে

আসে। এর ফলে অভিবাসন করে নতুন আবাসন গড়ে তোলা নিম্ন শ্রেণীর জন্য সব সময়ই কষ্টকর। নিজ এলাকায় অভিবাসন করতে চাইলেও সেটা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পেট্রনের সাহায্যের ওপর তাদের অভিবাসন নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে বিকল্প সুযোগগুলি থাকে। সামান্য হলেও নগদ অর্থের সংস্থান তারা করে রাখে. কারণ ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি চিন্তা করে এই শ্রেণী অনেক আগে থেকেই কৃষি জমির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনে। সন্তানদের স্কুল কলেজে লেখাপড়ায় করার এবং শিক্ষকতা সরকারী বেসরকারী চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি পেশায় নিজেদের সম্পৃক্ত করে। ফলে কৃষি জমি বিলীন হয়ে গেলেও এই শ্রেণী উৎপাদনের উপায় হতে উৎখাত হয় না। একাধিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে এদের কাছে নগদ অর্থ থাকে। ফলে তুলনামূলকভাবে দরিদ্র শ্রেণীর মত মধ্যবিত্তের অভিবাসন ততটা কঠিন হয়ে ওঠে না। অনেকেই আগে থেকেই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে রাখে এবং পদ্মার খুব কাছাকাছি এলাকায় অভিবাসন করতে চায় না। পদ্মা থেকে দূরের কোন এলাকা (যে এলাকা ৫/১০ বছরের মধ্যে ভাঙ্গার সম্ভাবনা নেই) তারা অভিবাসনের জন্য বেছে নেয়। কখনো আবার ঝিটকা, সাভার, মানিকগঞ্জ বা ঢাকায় স্থায়ীভাবে অভিবাসন করে এক্ষেত্রে অভিবাসনের এলাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কাজ করে। মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে অভিবাসনের কারণগুলিকে টেবিল-১ এ উল্লেখ করা হলো।

টেবিল-১: মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে অভিবাসনের কারণ

১.	জমির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস
২.	ভাঙ্গন পূর্ববর্তী সময়ের প্রস্তুতি
৩.	বাইরের সাথে যোগাযোগে গতিশীলতা
৪.	কৃষি থেকে স্থানান্তর
৫.	দূরে চলে যাওয়ার মানসিকতা
৬.	পাওয়ার কিছু থাকে না
৭.	শিক্ষা
৮.	নগরের সাথে যোগাযোগ
৯.	পেশা

সাধারণভাবে ধনী দরিদ্র সকলেই চায় নিজ এলাকার কাছাকাছি কোন গ্রামে অভিবাসন করতে। এর প্রধান কারণ নিজস্ব সম্পর্কের জাল কে চলমান রাখা। কাছাকাছি এলাকায় থাকলে নিজস্ব পরিমণ্ডলের মাঝেই বাস করা যায়- সারা জীবন ধরে যে মানুষগুলির মাঝে নিজের জীবন অতিবাহিত হয়েছে, হঠাৎ করেই তাদের থেকে বিচিছন্ন হয়ে যাওয়া সকলের জন্যই কষ্টকর। মানসিক কষ্টের চেয়েও বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা তাদেরকে নিজস্ব পরিমণ্ডলে থাকতে আগ্রহী করে তোলে। সেই সাথে তারা পরিচিতদের কাছ থেকেও সাহায্য সহজে পাওয়ার আশা করে। এজন্য ধনীদের ক্ষেত্রে অভিবাসনের জন্য প্রথম পছন্দ থাকে ভেঙ্গে যাওয়া নিজ গ্রামের কাছাকাছি কোন গ্রাম এবং সেখানে অভিবাসন করতেও সমর্থ হয়। কিন্তু দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন চাইলেই কোন নির্দিষ্ট একটি এলাকায় অভিবাসন করতে পারে না। অন্যান্য অবস্থা অনুকুল থাকলে তখনই কেবল তারা নিজেদের এলাকার কাছাকাছি অভিবাসন করতে পারে। কিন্তু সব কিছুই প্রতিকুল থাকলে রাস্তা, খোলা জমি, স্কুল প্রভৃতি জায়গায় তাদের আশ্রয় নিতে হয়। নিজস্ব পরিমণ্ডলে অভিবাসনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কারণগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

অভিবাসন ও ক্ষমতা সম্পর্ক

নিজস্ব পরিমণ্ডলে বাস করতে চাওয়ার একটি বড় কারণ ক্ষমতা কাঠামোতে নিজের অবস্থানকে ধরে রাখা। ধনীদের অনেকেই গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। কেউ কেউ যেমন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, চেয়ারম্যান বা সেক্রেটারী পদে রয়েছেন, তেমন গ্রামের অনেকেই জাতীয় রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পর্ক রক্ষা করেন। এদের সকলেরই রয়েছে নিজস্ব অনুসারী বা ক্লায়েন্ট। গ্রামের ধনী পেট্রন হিসাবে নিজ এলাকায় তারা তাদের আধিপত্যকে বজায় রাখতে চান এবং দরিদ্র ক্লায়েন্টদের বিভিন্ন সহায়তা করেন, যার মূখ্য উদ্দেশ্য দরিদ্র ক্লায়েন্টদের সমর্থন। বিভিন্ন নির্বাচন, সালিশ বা গ্রাম্য ক্ষমতা ব্যবস্থায় এই সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাঙ্গন কবলিত এলাকার কাছাকাছি অঞ্চলে থেকে গেলে ক্লায়েন্টদের সমর্থন প্রাপ্তি যেমন নিশ্চিত হয়, তেমনি এলাকায় বা নিজস্ব ইউনিয়নে ক্ষমতার প্রভাব অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু ইউনিয়ন বা থানা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে ক্ষমতা কাঠামোতে নিজের এই অবস্থান অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব না। ফলে ধনীদের অনেকেই নিজস্ব এলাকার মধ্যেই অভিবাসন করতে চান।

এই অভিবাসনে শুধু নিজের অবস্থানই মূল নিয়ামক নয়, ক্লায়েন্টরাও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ক্লায়েন্টদের অবস্থান ও সমর্থন ক্ষমতায় টিকে থাকাকে নিশ্চিত করে। একারণে ক্ষমতাবানদের লক্ষ্য থাকে দরিদ্র ক্লায়েন্টদেরও নিজের আবাসস্থলের কাছাকাছি কোন অঞ্চলে বসবাস করতে সহায়তা করা। যদি প্রচুর সংখ্যক ক্লায়েন্ট এলাকা ছেড়ে ভিন্ন ইউনিয়ন বা থানায় চলে যায়, তাহলে নির্বাচনের সময় তাদের ভোট প্রাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তাই নিজস্ব ক্ষমতাকে সুসংহত করা এবং নির্বাচনে জয়লাভের কৌশল হিসাবে ধনী শ্রেণীর লোক জন ভাঙ্গন কবলিত দরিদ্র মানুষদের সহায়তা করে। হারুকান্দি ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোশাররফ শিকদারের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রতিবার ভাঙ্গনের সময় তিনি পদ্মার কাছাকাছি এলাকায় নামমাত্র মূল্যে প্রচুর জমি ক্রয় করেন (নদীর কাছের এই জমি ভবিষ্যতে থাকবেনা বিধায় খুব অল্প দামে তা বিক্রি হয়) এবং সেসব জায়গায় কলোনী করে নিজস্ব অনুসারীদের আবাসনের ব্যবস্থা করে দেন। সেই এলাকা ভেঙ্গে গেলে আবার কাছাকাছি অন্য এলাকায় তিনি একই ভাবে কলোনী গড়ে তোলেন। অনেক ক্ষেত্রে আশ্রয় দাতা তার নিজের নামে কলোনীর নামকরণ করেন। হরিরামপুর থানায় এমন বেশ কয়েকটি কলোনীর সন্ধান পাওয়া যায় যেমন- মুন্নু কলোনী, মোশাররফ সিকদার কলোনী ইত্যাদি। এর ফলে ক্লায়েন্টদের সমর্থন এবং নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তি তিনি যেমন নিশ্চিত করেন তেমনি এর পাশাপাশি তিনি নিজেও এলাকায় থাকার ব্যবস্থা করে রাখেন। ব্যক্তির নামে এলাকার একটি অংশের পরিচিতিতে যেমন তার মহিমা কীর্তিত হয় তেমন এলাকায় তার প্রভাবও দীর্ঘদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

হারুকান্দি ইউনিয়নে, ভেলাবাদ ও কাণ্ঠাপাড়া গ্রামে তার অনুসারীদেরই বেশী দেখা গেছে। মোশাররফ শিকদার জাতীয় রাজনীতিতে বি এন পি-র অনুসারী। তিনি একই সঙ্গে স্থানীয় সাংসদ হারুনুর রশীদ মুন্নুর ক্লায়েন্ট হিসাবেও কাজ করেন। মুন্নু জাতীয় নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তির কৌশল হিসাবে মোশাররফ শিকদারকে সহায়তা করেন এবং তার মাধ্যমে এলাকায় নিজস্ব প্রভাব বজায় রাখেন। ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় মুন্নু অর্থ সাহায্য পাঠান মূলত মোশাররফ শিকদারের মাধ্যমে মাঝেমাঝে তিনি নিজেও কখনো এসে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার প্রতি ৫০/১০০ টাকা করে দেন। মাঝেমাঝে হেলিকপ্টারে করেও তিনি এলাকায় আসেন যা বর্তমানে একটি আলোচিত বিষয়। ভোট প্রাপ্তি এবং নিজস্ব ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য তথা জাতীয় রাজনীতিতে তার অবস্থান ক্রমাগত বৃদ্ধি করার জন্য মোশাররফ শিকাদার পদ্মার কাছাকাছি এলাকাতেই থেকে যান প্রতিবার।

আবার কখনো কখনো ভোট কেন্দ্রিক নির্বাচন মুখী রাজনীতির বাইরে শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে দীর্ঘ দিনের প্রভাব প্রতিপত্তিকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য অনেকেই কাছের এলাকাতে অভিবাসন করেন। ভেলাবাদ গ্রামে পদ্মার থেকে মাত্র ৪০/৫০ গজের দূরত্বে বসবাসরত একজন ধনীর স্ত্রী জানিয়েছেন, যদিও তার দুই ছেলে ঢাকায় প্রেসে কাজ করে (যদিও এ পেশায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে স্বচ্ছল ভাবে বসবাস করা সম্ভব নয়, তবে বাড়তি আয়ের উৎস ভাঙ্গন প্রবন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে গুরুত্ব পেয়ে থাকে) তা সত্ত্বেও তারা ঢাকায় যেতে আগ্রহী নন। তারা এই এলাকারই কাছাকাছি কোথাও থাকতে চান। কারণ তার স্বামী প্রায় ২৫ বছর ধরে হারুকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে এই এলাকায় তাদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। দূরের এলাকায় অভিবাসন করলে সেই ক্ষমতা সম্মান আর থাকবে না। বরং দূরবর্তী অপরিচিত এলাকার মানুষদের সম্মান করে, ভয় করে চলতে হবে। ক্ষমতা হারানোর এই আশংকায় তারা বাইরের কোন এলাকায় অভিবাসন করতে ইচ্ছুক নন। তার বড় ছেলে বলেছেন, "এখনো আমি গ্রামের কাউকে ডেকে দুটো কথা বললে সে অমান্য করে না। গ্রামের সকল বিচার-সালিশে বাবাকে ডাকে। ঘর থেকে বের হলে মানুষ সালাম দিয়ে কথা বলে। কিন্তু সাভার অথবা মানিকগঞ্জ গেলে আমরা সেখানে *নদী ভাঙ্গনী* হিসাবেই গৃহীত হবো। সেখানে আমাদের সম্মান তো থাকবেই না, নদী ভাঙ্গনী বলে লোকে হেয় করবে, উপরন্তু সেই লোকদেরকে সম্মান করে চলতে হবে। প্রভাব প্রতিপত্তি, সম্মান সবই আমরা হারাবো। কিন্তু এই হরিরামপুরে থাকলে ক্ষমতা বা সম্মান হারানোর কোন ভয় থাকবে না"।

একই রকম ঘটনা অন্যান্য ধনী গৃহস্থের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। বলরা ইউনিয়নের দাশকান্দি গ্রামে একটি শিক্ষক পরিবার ছিল, পদ্মার ভাঙ্গনে যাদের প্রায় একশত পাখি জমি বিলিন হয়ে গিয়েছিল। এখন তারা বসবাস করছেন দাশকান্দি গ্রামেরই কাছে উপজেলা অফিসের পিছনে (ভেলাবাদ গ্রামের পুরনো পাড়া)। সম্মান হারানোর আশংকায় এই ধনী পরিবারটি খুব বেশী দূরে যেতে চায়নি। তাছাড়া পরিবারের প্রধান ব্যক্তিটি গ্রামের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বলে এলাকায় তার বাড়তি সম্মান ছিল। তিনি বলেন, *"দূরে গেলে কেউ সম্মান দেবে না। আপন মানুষের মধ্যে কষ্টে থাকাও ভাল।"*

এসব কারণে দেখা যায় ক্ষমতাই অভিবাসনে বড় নিয়ামক হয়ে উঠে। সামাজিক সম্মান পূর্বের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং কখনো পূর্বের দাপট বজায় রাখার জন্য উচচ শ্রেণীর লোকজন নিজ গ্রামের কাছাকাছি এলাকায় থাকেন। বারবার ভাঙ্গনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তারা পদ্মা পাড়েই থেকে যান।

ইউনিয়ন পরিষদের সুবিধা প্রাপ্তি

হরিরামপুর থানার তেরটি ইউনিয়নের মধ্যে পাঁচটি পুরোপুরি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিকভাবে সবগুলি ইউনিয়নকে বিলুপ্ত করা হয়নি। কোন কোন ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সেখানকার ক্ষমতাবান ব্যক্তিগণ মিলে তাদের প্রভাব খাটিয়ে *"খাতা কলমে"* ইউনিয়ন গুলোর অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। এটি করা হয় মূলতঃ ইউনিয়ন পরিষদের নামে বরাদ্দ টিকিয়ে রাখার জন্য। ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিকভাবে টিকে থাকলে বিভিন্ন কাজের নামে অর্থও গম বরাদ্দ আসে। সেই সাথে দূর্যোগ কালীন সময়ে ত্রাণ সহায়তাও ভিজিএফ কার্ড ইত্যাদি পাওয়া যায়। সেসব বরাদ্দ থেকে বিভিন্ন সুবিধাও পায় কর্মকর্তা এবং এলাকার ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা (চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য ইত্যাদি)। ল্যাছড়াগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ এর অন্যতম উদাহরণ। এই ইউনিয়নের সমস্ত ভূখণ্ড পদ্মায় বিলীন হয়ে গেলেও এটি এখনও প্রশাসনিকভাবে টিকে আছে।

ক্ষমতাবানদের অর্থ প্রাপ্তি ও আধিপত্য বজায় রাখার এই প্রক্রিয়া চলমান থাকার কারণে দেখা গেছে, তাদের অধিকাংশই ঐ বিলীন হয়ে যাওয়া ইউনিয়নের কাছেই বসবাস করেন বা অভিবাসন করেন। দূরবর্তী এলাকায় চলে গেলে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিভিন্ন প্রজেক্টের নামে নানা ধরনের প্রাপ্তিটুকু থাকে না। কিন্তু একই ইউনিয়নে থেকে গেলে প্রশাসনিকভাবে এসব বরাদ্দের অনেক বড় অংশ তাদের দখলে থাকে। ফলে শুধুমাত্র তাদেরই যে ঐ ইউনিয়নের কাছাকাছি থাকতে হয় তাই নয়, তারা একই সঙ্গে সেখানকার ভোটারদের ও নিজস্ব অনুসারীদেরও কাছাকাছি রাখতে চান। কারণ গম, ভিজিএফ কার্ড, অর্থ ইত্যাদি দরিদ্র লোকদের নামেই বরাদ্ধ হয়। অনেক সময় নিজস্ব অনুসারী ভোটারগণ দূর দূরান্তে চলে গেলেও চেয়ারম্যানরা তাদের খাতা কলমে ঠিকই ভোটার করে রাখে। ফলে ভোটারদের উপস্থিতির কারণেও ইউনিয়ন পরিষদটি প্রশাসনিকভাবে টিকে থাকে। নির্বাচনের সময় দেখা যায়, চেয়ারম্যান বা ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা দূরবর্তী অঞ্চল থেকে নিজস্ব ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আসার ব্যবস্থা করে। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি ভোট প্রাপ্তি ও অর্থ বা প্রশাসনিক

বরাদ্দ প্রাপ্তির কারণ গুলিও ক্ষমতাবান ধনী ব্যক্তিদের অভিবাসনে প্রভাব বিস্তার করে।

জমির উপর দখল

দূরবর্তী অঞ্চলে অভিবাসন না করার আরেকটি কারণ হচেছ জমির উপর দখল রাখা। ধনী ব্যক্তিদের জমি শুধুমাত্র নিজের গ্রামেই বা কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রামে সীমাবদ্ধ থাকে না। কৃষি জমি নিজের গ্রামে তো থাকেই, পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামেও তাদের জমি থাকে। দেখা গেছে, নদীভাঙ্গনের শিকার হয়ে কোন গ্রামের সমস্ত জমি পদ্মায় বিলীন হয়ে গেলেও পাশের গ্রাম বা কিছুটা দূরের গ্রাম তখনো পদ্মায় বিলীন হয়ে যায় না। ফলে সেখানকার জমিগুলিও অক্ষত রয়ে যায়। আর সেই জমি দখলে রাখার জন্য ধনী ব্যক্তিরা পূর্বের এলাকা থেকে অনেক দূরে অভিবাসন করেন না। কারণ নিজস্ব এলাকা থেকে দূরে চলে গেলে পুরনো জমির উপর থেকে দখল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে গ্রামের ক্ষমতাশালী অন্য কোন ব্যক্তি ঐ জমি দখল করে নিতে পারে। একই ইউনিয়নে থাকলে জমির উপর দখল হারানোর আশংকা থাকে না।

এসব ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তিরা নিজেরা সরাসরি ঐ জমি চাষ করেন না, পরিচিত বা দরিদ্র ক্লায়েন্টদের কাছে বর্গা (*শন কুড়ালী*) দেন। কেউ কেউ আবার জমি বর্গা না দিলেও নিজের লোক দিয়েই জমি চাষ করান। মৌসুম শেষে *"ভাওর বাড়ীতে"* থেকে ফসল নিয়ে আসেন।

বর্তমানে ভেলাবাদ গ্রামে বসবাসরত একজন ধনী ব্যক্তি জানিয়েছেন, নিজের জমি দখলে রাখার জন্য তিনি দূরবর্তী এলাকায় অভিবাসন করেননি। সাভার, মানিকগঞ্জ, ঝিটকা প্রভৃতি এলাকায় তার আত্মীয় ও পরিচিত অনেকেই তাকে আসতে বলেছিল, কিন্তু তিনি সেসব অঞ্চলে যান নি। কারণ তার আদি নিবাস ছিল হারুকান্দি ইউনিয়নের হারুকান্দি গ্রামে। এই ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন দাগে তার প্রায় ১০০ বিঘা জমি ছিল। এই জমির বেশীর ভাগ পদ্মায় বিলীন হয়ে গেলেও কিছু কিছু জমি এখনো রয়ে গেছে। একারণে তিনি হারুকান্দি গ্রাম ছেড়ে প্রথমে ঐ ইউনিয়নেরই নারায়ণকান্দি ও পরে ভেলাবাদ গ্রামে অভিবাসন করেন। কৃষিজমিগুলো দখলে রাখার উদ্দেশ্যে তাকে কাছাকাছি গ্রামে অভিবাসন করতে হয়েছে। যেসব জায়গায় তার জমি আছে, সেখান তিনি *ভাওর বাড়ী* তুলে ফসল

নিয়ে যান। জমির উপর দখল বজায় রাখা ও সেখান থেকে ফসল প্রাপ্তি হচ্ছে একই ইউনিয়নের মধ্যে তার অভিবাসন করার অন্যতম কারণ।

আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ

অভিবাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে কাজ করে আত্মীয়তার সম্পর্ক। এটি মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যাদের সাথে আত্মীয়দের সম্পর্ক ভাল তারা নদী ভাঙ্গনে গৃহহারা হওয়ার পরে আত্মীয়-স্বজন, বিশেষ করে দূরের ভাই-বোন বা শ্বশুরের বাড়িতে আশ্রয় পায়। এই আশ্রয় প্রদানকারী আত্মীয়রা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনী গৃহস্থ। বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মায়ের দিকের বা বোনের দিকের কোন আত্মীয়ের কাছে কেউ আশ্রয় নিতে চায় না। বিশেষ করে বোনের শশুরবাড়ী বা স্ত্রীর বাবা/ভাই/বোনের বাড়ীতে যাওয়ার ব্যাপারে অনেকেরই অনাগ্রহ থাকে। কিন্তু দূর্যোগ কালীন সময়ে এই মতাদর্শগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। একারণেই দেখা গেছে, পদ্মার ভাঙ্গনে গৃহহারা হারা হয়ে মানুষ আশ্রয়ের জন্য যে কোন আত্মীয়কে বেছে নিয়েছে। কখনও তারা ভাইয়ের বা চাচার বাড়ীতে গেছে, কখনও বোনের বাড়ীতে কিংবা মামা, ফুফু খালা বা দূরের যে কোন আত্মীয়ের কাছেও আশ্রয় নিয়েছে। কেউ কেউ শশুরবাড়ীতে গিয়েছে। এক বোন আরেক বোনের শশুরবাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছে, আবার ভাইয়ের বাড়ীতে সে ভাঙ্গন কালীন সময়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাই ভাঙ্গনকালীন দূর্যোগ সময়ে সম্পর্কটাই মূখ্য হয়ে ওঠে। স্ত্রীর দিকের আত্মীয় নাকি বোনের শশুরবাড়ীর দিকের আত্মীয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তখন ভাঙ্গন কবলিত মানুষ যে কোন অবলম্বনকেই ধরে বাঁচতে চায়। পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শকে ছাপিয়ে বেঁচে থাকার নিরাপত্তাই তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে শুধুমাত্র যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনই আত্মীয়দের কাছে আশ্রয় খোঁজে তা নয়, উচচ বা নিম্ন শ্রেণীর অভিবাসনের ক্ষেত্রেও জ্ঞাতি সম্পর্ক কাজ করে।

অবশ্য বেশীরভাগ মানুষই দীর্ঘদিন আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে চায়না। বিকল্প কোন উপায় হলে বা কাছাকাছি কোথাও জায়গা কিনে ঘর তুলতে পারলে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তারা দ্রুত চলে আসেন। এর কারণ আশ্রিত হিসাবে আত্মীয়ের কাছে থাকলে যেমন নিজের মর্যাদা হ্রাস পায়, তেমনি কখনও আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন পদ্মায় বাড়িঘর সব নিয়ে গেলেও আত্মীয়ের কাছে যাবো না। তাদের সঙ্গে ঝগড়া-ফ্যাসাদ বাঁধে,

সম্পর্ক নষ্ট হয়, স্বাধীনভাবে থাকা যায় না। এসব কারণে অনেকে আত্মীয়দের বাড়ীতে অভিবাসন করতে চান না।

দূরবর্তী অঞ্চলে অভিবাসন

এলাকার পরিচিত লোকদের মাঝে থাকাই ভাঙ্গন কবলিত মানুষের প্রথম পছন্দ, তারপরেও সবাই পদ্মার কাছাকাছি অঞ্চলে থেকে যায় না। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অনেকে দূরবর্তী অঞ্চলে চলে যায়। দূরের অঞ্চলের মধ্যে সাভার, মানিকগঞ্জ, তুরা, মৌচাক, গাজীপুর, ঢাকা, ধামরাই এসব এলাকা প্রাধান্য পায়। দূরবর্তী অঞ্চলে যারা যায় তারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত এবং উচচ শ্রেণীর। এসব ক্ষেত্রে তারা একক ভাবেই অভিবাসবন করে। যৌথতাকে পরিহার করে শুধুমাত্র নিজ পরিবারকেই তারা প্রাধান্য দেয়। এসব ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে পরিবারের যেখানে যাওয়ার সামর্থ সে পরিবার সে অঞ্চলে গিয়েছে। জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে অভিবাসন করেছে এবং নতুন এলাকায় ঘর তুলেছে।

মূলতঃ যাদের কাছে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ ছিল, তারাই দূরবর্তী অঞ্চলে অভিবাসন করতে পেরেছে। কিন্তু প্রচুর জমি থাকা সত্বেও যাদের কাছে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ ছিল না তারা দূরে যেতে পারেনি। কারণ ভাঙ্গন কালীন সময়ে জমি তার আর্থিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। নগদ অর্থ তখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। নগদ অর্থের পাশাপাশি যে সমস্ত পরিবারের কোন এক বা একাধিক সদস্য ঢাকা, সাভার বা দেশের বাইরে (মূলতঃ মধ্যপ্রাচ্যে) কাজ করতো, তাদের পক্ষে পদ্মা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে অভিবাসন সহজতর হয়েছে। কারণ এসব পরিবার বাইরে থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়েছে। কিন্তু যেসমস্ত পরিবারের কোন সদস্য হরিরামপুর থানার বাইরে কোন ধরনের চাকুরী বা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হরিরামপুর থানার মধ্যেই পদ্মার আশপাশের কোন অঞ্চলে অভিবাসন করেছে।

ঢাকা, সাভার, তুরা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর প্রভৃতি এলাকায় যারা অভিবাসন করে, তাদের অধিকাংশই সেখানে নতুন ঘর তুলে স্থায়ী হয়ে যায়, বসবাসের নতুন স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে তারা সেই অঞ্চলকেই বেছে নেয়। এর পাশাপাশি এই মানুষগুলি সেখানে কাজ করার অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের উপায়গুলি নির্দিষ্ট করে ফেলে। ধীরে ধীরে সেখানে নিজস্ব নেট-ওয়ার্ক ও গড়ে তোলে। আবার এমন দেখা গেছে,

সাভার বা মানিকগঞ্জে যখন কোন ধনী পরিবার অভিবাসন করে সেখানে স্থায়ী হয় তখন তারা চেষ্টা করে আশেপাশে নিজস্ব চেনা লোকদের নিয়ে আসতে। তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বা পরিচয়ের সূত্র পরবর্তী সময়ে ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় অনেকেই সেখানে চলে আসে, জমি কিনে ঘর তোলে।

কিন্তু আবার এমনও হয়েছে যে, নতুন এলাকায় কোন ভাঙ্গন কবলিত গৃহস্থ ভালোভাবে গৃহীত হয়নি। কারণ ভাঙ্গন কবলিত এলাকা মানুষ অনেক জায়গার স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে *"নদী ভাঙ্গনী"* বলে হেয় দৃষ্টিতে গৃহীত হয়। স্হানীয় অধিবাসীদের সাথে ভালোভাবে মিশতে না পেরে তারা তখন আবার পুরনো এলাকার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যদিও বেশীরভাগ সময়ই সেই এলাকা ততদিনে পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে তথাপি তারা পদ্মার কাছাকাছি কোন একটি এলাকায় যেতে চেষ্টা করে যেখানে তাদের পুরনো প্রতিবেশী, চেনা মানুষ বা আত্মীয় স্বজন আশ্রয় নিয়েছে বা যে অঞ্চলে তাদের বেশী পাওয়া চায়। সাভার, মানিকগঞ্জ বা গাজীপুরের মতো এলাকাগুলো থেকে তারা পুরো পরিবার নিয়ে আসে না, কিন্তু পরিচিতদের পাওয়া যায় এমন এলাকায় অস্থায়ী একটি ঘর তোলে। সেখানে মাঝে মাঝে তারা এসে থেকে যায়। বিশেষ বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে তারা পরিবার নিয়ে চলে আসে পুরনো আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের সাথে উৎসব উদ্‌যাপন করতে। বছরের অবশিষ্ট সময়ে তারা চেনা কোন প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের সেই নতুন বাড়িতে থাকতে দেয়। ভেলাবাদ গ্রামের লতিফ চৌধুরী তেমনই একজন ধনী ব্যক্তি, যিনি এই গ্রাম ছেড়ে ২ বছর আগে পরিবার নিয়ে ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তার পুরনো বাড়িতে আবার ফিরে আসেন, তার চাচাত ভাইয়ের পরিবারকে সেখানে তুলে দিয়ে যান এবং বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে ভেলাবাদ গ্রামে ফিরে আসেন।

সম্পর্কের জাল এবং অভিবাসনে তার প্রতিফলন

উচচ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম পরিচিতি অভিবাসনের অন্যতম নিয়ামক। এই পরিচিতি ব্যক্তিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে বিস্তৃত হতে পারে। ভাঙ্গন কালীন সময়ে এই পূর্ব পরিচিতি বা সম্পর্কের নেটওয়ার্কের কারণে তারা বিভিন্ন সহায়তা পায়। যেমন-

১। ভাঙ্গনকালীন সময়ে সাহায্য
২। অভিবাসনের সহায়তা
৩। মধ্যবর্তীকালীন সাহায্য

কোন বিশেষ অবস্থা সম্পন্ন পরিবারকে ঐ দূর্যোগকালীন সময়ে পরিচিতরা নিজেদের বাড়ি বা কাছাকাছি জায়গায় উঠে আসার আমন্ত্রণ জানায়। এছাড়া পদ্মায় বিলীন হতে থাকা পুরনো বসতবাড়ীর গাছপালা ও বিভিন্ন সম্পদ বিক্রি, ঘরের মালপত্র স্থানান্তর , খাদ্যে সহায়তা, কখনো আর্থিক সহায়তা, গৃহ তৈরীর জমি প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পরিচিত ব্যক্তিরা এগিয়ে আসে। নেটওয়ার্কের এই বিস্তৃতির কারণেও ধনী ব্যক্তিদের কেউ কেউ পরিচিতদের মাঝে অভিবাসন করেন। তবে এসব অভিবাসন সাধারণত যৌথতাকে পরিহার করে এককভাবে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন রকম পরিচিতির মধ্যে রাজনৈতিক পরিচিতি সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

নারায়ণকান্দির জব্বার চৌধুরী সেখানকার অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে বিএনপি'র রাজনীতির সাথে জড়িত। আবার তার ছেলে হরিরামপুর থানা ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় নেতা। নারায়ণকান্দি গ্রামে যখন পদ্মার ভাঙ্গন তীব্র হয়ে ওঠে তখন জব্বার চৌধুরী'র অনেক রাজনৈতিক বন্ধুরা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে আসার আহ্বান জানায়। সবাই তাকে বলে *"আপনি আমার বাড়িতে চলে আসেন, যতদিন খুশী থাকেন, কোন অসুবিধা নাই।"* বর্তমানে ভেলাবাদে যে বাড়িতে তিনি আছেন, সেখানে রাজনৈতিক পরিচয়ের সূত্রে তিনি আশ্রয় পেয়েছেন এবং নতুন করে ঘর তুলেছেন।

সার্বিকভাবে উচচ শ্রেণীর অভিবাসনকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়- স্থানীক পর্যায়ে অভিবাসন এবং দূরবর্তী পর্যায়ে অভিবাসন। নিজস্ব এলাকায় আধিপত্য বজায় রাখা এবং ক্ষমতা ও সম্মান প্রাপ্তির আশায় তারা যেমন অভিবাসনের জন্য পদ্মা পাড়ের অঞ্চলগুলিতে থেকে যায়, তেমনি কৃষির উপর নির্ভরশীলতা, জমি দখল, রাজনৈতিক পরিচিতি, নির্বাচনে জয়লাভ, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নানা রকম সুবিধা প্রাপ্তি ইত্যাদি কারণেও তারা নিজস্ব অঞ্চল ছাড়তে পারে না। পদ্মার ভাঙ্গনের পর একই ইউনিয়নের কোন গ্রামে অথবা প্রাক্তন আবাসস্থলের পার্শ্ববর্তী গ্রামে তারা নতুন করে ঘর তোলে। এভাবে পদ্মা পাড়ের আশপাশের অঞ্চলগুলিতেই তারা নতুন ঠিকানা গড়ে নেয়। কিন্তু এলাকার রাজনীতিতে যখন তারা ধীরে ধীরে প্রান্তিক হতে থাকে, তখন তারা পদ্মা পাড়ের ঠিকানা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়। ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় থাকা সত্ত্বেও যখন ইউনিয়ন বা নিজস্ব এলাকা বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির আশা থাকে না কিংবা নির্বাচনমুখী রাজনীতিতে নিজস্ব অবস্থান হারাতে থাকে তখন পদ্মা পাড়ের প্রতি তাদের আগ্রহ

কমতে থাকে। নদী ভাঙ্গনের সমস্যা গুলিই তখন মুখ্য হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি নগর অঞ্চলে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং শিক্ষা ও পেশায় প্রবেশাধিকার থাকার কারণে তারা দূরবর্তী অঞ্চলে নতুন ঠিকানা গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যেহেতু উচচ শ্রেণীর আর্থিক সচছলতা থাকে তাই সেই পরিস্থিতিতে অভিবাসন করে দূরবর্তী অঞ্চলে চলে যাওয়াও সহজতর হয়। কখনো আবার পরিবারের কোন সদস্যের বিদেশে চাকুরী, নগরাঞ্চলে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের কারণেও অনেক পরিবার প্রথম ভাঙ্গনের পরপরই পদ্মা পাড় ছেড়ে নগরাঞ্চলে অভিবাসন করে। উচচ শ্রেণীর অভিবাসনের এই নিয়ামকগুলিকে ছকে (টেবিল -২) উল্লেখ করা হয়েছে:

টেবিল -২: ধনীদের ক্ষেত্রে অভিবাসনের কারণ

স্থানিক পর্যায়ে অভিবাসন	দূরবর্তী অঞ্চলে অভিবাসন
১. নিজস্ব সম্পর্কের জাল বাজায় রাখা	১. পেশাজীবি দল
২. ক্ষমতা কাঠামোতে নিজের অবস্থান বজায় রাখা	২. অর্থনৈতিক স্বচছলতা
৩. নির্বাচন	৩. দূরবর্তী অঞ্চলে সম্পর্কের জাল
৪. সম্মান মর্যাদা ও / সম্মানহানীর আশংকা	৪. আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক
৫. ভূমির উপর নির্ভরশীলতা	৫. ভবিষ্যৎ চিন্তা
৬. জমির উপর দখল	৬. শিক্ষা ও কর্মসংস্থান
৭. জমির সহজ প্রাপ্যতা	৭. বিদেশে চাকুরী
৮. আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক	৮. ভূমির উপর নির্ভরশীলতা কম থাকা
৯. অর্থনৈতিক স্বচছলতা	৯. দূরবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগ
১০. ব্যক্তিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি	

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা এবং দরিদ্র শ্রেণীর অভিবাসন

দরিদ্রদের অভিবাসন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দলবদ্ধভাবে ঘটে থাকে। কারণ অভিবাসনকে তারা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করেন। অভিবাসন সম্পন্ন করে কোন এলাকায় বসতি গড়ার পরও অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। নতুন এলাকায় স্থানীয়দের হুমকি, আর্থিক সমস্যা, কাজের সংস্থান, রোগ-শোক, নতুন করে ঘর তোলা, বিয়ে, সন্তানের জন্ম, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে

পরিচিত লোকের সহায়তা প্রয়োজন। পরিচিতদের মাঝে থাকার মধ্যদিয়ে মানসিক দৃঢ়তাও প্রকাশ পায় যা দূর্যোগ মোকাবেলায় সহায়ক হয়। এ কারণে নিম্নশ্রেণীর লোকজন যৌথভাবে পরিচিতদের নিয়ে অভিবাসন করে। কারণ এককভাবে অভিবাসন পরবর্তী যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, চেনা পরিচিতদের মাঝে থাকলে সে সব সমস্যা কম হয়। এর পাশাপাশি ঘর বাড়ি, মালপত্র স্থানান্তরের চেনা পরিচিত মানুষ সাহায্য করে। কিন্তু এককভাবে অভিবাসন সব সময়েই কষ্টকর। মূলতঃ সামাজিক নিরাপত্তার কারনেই দরিদ্র মানুষেরা দলবদ্ধভাবে অভিবাসন করে। এছাড়া যাদের ঘরে অবিবাহিত মেয়ে থাকে তারা কখনই এককভাবে কোথাও যায় না বা একা থাকে না। নিরাপত্তার কারণে তাদের পরিচিত লোকজনের মাঝে থাকতে হয়। এর পাশাপাশি বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্ত নারীরাও দলবদ্ধভাবে অভিবাসন করে। বিশেষ করে যে সমস্ত নারীদের স্বামী নেই বা বড় ছেলে নেই তারা পরিচিত জনদের সাথেই থাকে। পেশাগত সুবিধার জন্য দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ করে জেলে সম্প্রদায় দলবদ্ধভাবে স্থানান্তর করে।

এসব কারণে দেখা যায় যৌথভাবে অভিবাসন এখানকার দরিদ্রদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ দেখা যায় ভাঙ্গনের চূড়ান্ত মূহুর্তের আগ পর্যন্ত তারা নিজের আবাস স্থলেই থাকে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রথমে তারা আশপাশের কয়েকটি পরিবার মিলে আলোচনায় বসে। এই আলোচনায় শুধু গৃহ প্রধান বা পুরুষরাই থাকে না, নারীদের উপস্থিতিও সেখানে লক্ষ্য করা যায়। এর মাধ্যমেই তারা ঠিক করে, বাসস্থান পরিবর্তন করে কোথায় প্রাথমিক আশ্রয় পাওয়া যাবে বা এখন তারা কোথায় যাবে। তবে কেউ কেউ আত্মীয়দের কাছে বা নিকটতম কোন প্রতিবেশীর কাছে আশ্রয় পেয়ে সেখানে চলে যায়। অনেকে আবার পাশের গ্রামের কোন ধনী ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

নিম্নশ্রেণীর ক্ষেত্রে যৌথভাবে অভিবাসনই বেশী। সেক্ষেত্রে তারা ধনীদের কাছে যায় আশ্রয় পাওয়ার আশায় । স্হানীয়ভাবে রহিম চেয়ারম্যান, মোশাররফ শিকদার, জব্বার চৌধুরী, মুন্নু এমপি প্রমুখ ধনী ব্যক্তি এখানে পেট্রন হিসাবে পরিচিত। দরিদ্র ব্যক্তি এদের ক্লায়েন্ট হিসাবে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সহায়তা, আশ্রয়, মৌসুমী কাজ, নিরাপত্তা প্রভৃতি পেয়ে থাকে। ধনী ব্যক্তিরা ভাঙ্গনকালীন সময়ে নিজের গৃহে বা জমিতে তাদের আশ্রয় দেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তিরা ভাঙ্গন কবলিত এলাকার কাছাকাছি কোন গ্রামে অল্প দামে বেশ কিছু জমি কিনে দরিদ্রদের থাকতে দেন। তারা সেখানে অভিবাসন করে চলে আসে এবং

নতুন করে ঘর তোলে এভাবে কোন ধনী ব্যক্তির ক্লায়েন্ট হিসাবে গ্রামের ২০/৩০ টি পরিবার একই জায়গায় আশ্রয় পায় এবং সেখনে যৌথভাবে অভিবাসন করে। গবেষিতদের ৫০ জন তথ্যদাতার মাঝে ২১ জন পেট্রনের কাছে আশ্রয় পেয়েছেন।

কিন্তু সব সময় পেট্রন তার দরিদ্র ক্লায়েন্টদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না। তখন ভাঙ্গন কবলিত পরিবারগুলি একত্রিত হয়ে রাস্তার ধারে বা কোন খোলা মাঠে অভিবাসন করে। ২০/২৫টি পরিবার এভাবে একত্র থাকার পেছনে কাজ করে একই আদি নিবাস স্থলে বসবাসের অভিজ্ঞতা, পূর্ব পরিচয়, জ্ঞাতি সম্পর্ক, ভাঙ্গন পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, প্রতিবেশী ইত্যাদি বিষয়। গবেষিত গ্রামের কাণ্ঠাপাড়া রাস্তার দুপাশে যারা বাস করছে তারা এভাবেই একত্রিত হয়ে অভিবাসন করেছে। মূলতঃ সামাজিক নিরাপত্তা, আর্থিক সহায়তা, বিভিন্ন সাহায্য প্রভৃতি কারণেই বেশ কতগুলি পরিচিত পরিবার একত্রে থাকে এবং যৌথভাবে অভিবাসন করে।

আবার নেটওয়ার্কের বিস্তৃতির কারণেও অভিবাসনে সুবিধা পাওয়া যায়। নারায়ণকান্দি গ্রাম ভেঙ্গে গেলে সেই গ্রামের ২০/২৫ টি পরিবার মোশাররফ শিকদারের কাছে আসে এবং তিনি ভেলা বাদ গ্রামের পুরনো পাড়ায় জমি কিনে তাদের থাকতে দেন। কিন্তু নারায়নকান্দির পাশের গ্রাম কাজীরবাগ পরের বছর ভেঙ্গে গেলে সেখানকার কিছু অধিবাসী সরাসরি মোশাররফ সিকদারের কাছে যায়নি। তারা ভেলাবাদ গ্রামের মোশাররফ শিকদার কলোনীতে বসবাসরতদের মাঝে নিজেদের পরিচিত লোক খুঁজে বের করে এবং পরিচিতদের সহায়তায় সেখানে আশ্রয় পায়। পূর্বপরিচয়ের সূত্রে এভাবে তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হতে থাকে এবং এক জায়গায় অনেকগুলি পরিবার একসাথে থাকতে শুরু করে। এভাবে দেখা যায় ভাঙ্গন কবলিত নিম্ন শ্রেণীর একটি বিস্তৃত সম্পর্কের জাল থাকে। তার মানে ভাঙ্গন কালীন সময়ে কোথায় আশ্রয় পাওয়া যাবে হয় তারা নিজস্ব পেট্রনের কাছে যায় অথবা পরিচিত লোক (যারা কোন কলোনীতে রাস্তায় বা সরকারী জমিতে বাস করছে) দের কাছে আশ্রয় পায় আর এমনি করে তারা পুরো মানিকগঞ্জেই সম্পর্কের এক বিস্তৃত জাল তৈরী করে।

কখনও পেশাগত সুবিধার কারণেও একটি জনগোষ্ঠী একত্রে অভিবাসন করে। সেক্ষেত্রে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা যেমন সহজতর হয় তেমনি অভিবাসন পরবর্তীতে ঝুঁকিও কম থাকে। একই পেশার লোকজন কাছাকাছি থাকলে তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারণ তারা একই

সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকে এবং বিভিন্ন সহযোগিতা পায়। এই সহযোগিতা সম্পর্কেও আবার ভাঙ্গন পরবর্তী দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়ক হয়। কাষ্ঠাপাড়ার জেলেদের মধ্যে দেখা গেছে, পেশার সুবিধার কারণে তারা সব সময় একত্রিত থাকেন এবং যৌথভাবে অভিবাসন করেন। মাছ ধরার জন্য কমপক্ষে ৫/৬ জন জেলে একত্রে থাকা অপরিহার্য এবং সবার জাল জোড়া দিয়েই তাদের মাছ ধরতে হয়। তাই এসব দরিদ্র জেলেরা যৌথভাবেই অভিবাসন করেন। দরিদ্র শ্রেণীর অভিবাসনগুলিকে টেবিল-৩ এ উল্লেখ করা হলো।

টেবিল - ৩: দরিদ্র শ্রেণীর অভিবাসন

যৌথ এবং এলাকা ভিত্তিক	একক
১. অর্থনৈতিক অবস্থা	১. জ্ঞাতি সম্পর্ক
২. পেশাজীবি দল	২. আর্থিক স্বচছলতা
৩. জমির দামের স্বল্পতা	৩. পেশা (মৌসুমী)
৪. নিজস্ব পরিমণ্ডল	৪. পরিচিতি
৫. সাহায্য/রিলিফ প্রাপ্তি	
৬. ঘরে মেয়ে থাকা	
৭. স্বামী/ছেলে না থাকা	
৮. ক্ষমতাবানদের সাথে সম্পর্ক	
৯. সামাজিক নিরাপত্তা	
১০. ঝুঁকি গুলিকে যৌভাবে গ্রহণ করা/প্রতিরোধ	

জেগে ওঠা নতুন চরে যাওয়া

নদী ভাঙ্গনে মানুষ যেমন তার স্থায়ী নিবাস হারায় আবার কখনও সেই জমি নতুন করে জেগে উঠলে অধিকাংশ মানুষই আর ফিরে যেতে চায় না- ধনীরা তো নয়ই। শুধুমাত্র যারা চরম দরিদ্র এবং যাদের থাকার কোন জায়গা নেই তারাই ফিরে যায়। চরে (এই নতুন ভাবে জেগে উঠা জমি) ফিরে না যাওয়ার অন্যতম কারণ হচেছ সেখানে বসবাস করার মত ভৌত অবকাঠামো থাকে না। তা ছাড়া নতুন জেগে ওঠা চরে ফসল ভালো হয় না। শুধুমাত্র ছন, ঝোপঝাড়, বাদাম, তরমুজ, বাঙ্গী ইত্যাদি ফসল সেখানে জন্মে। পুরো চর জুড়ে থাকে শুধু বালি আর বালি যা যাতায়াতের অন্যতম প্রতিবন্ধক। তাছাড়া নতুন চরে স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, ব্যাংক অফিস, পুলিশ স্টেশন, থানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার তাৎক্ষনিক সম্ভাবনা থাকে না। এসব কারণে মানুষ নতুন চরে ফিরে যেতে চায় না। বিশেষ

করে নিরাপত্তাহীনতা চরে ফিরে যেতে না যাওয়ার বড় কারণ। কিন্তু এসব কারণের থেকেও ধনীদের কাছে বড় হচেছ সামাজিক সম্মান। "চরে কোন সমাজ নাই" "চরে ফিরে গেলে সম্মান থাকে না", "ভদ্র ঘরের কেউ নতুন চরে ফিরে যায় না", ধনীদের সবাই চরে ফিরে না যাওয়ার পেছনে এসব কথা বলেছেন। তাদের মতে, শুধু গরীব মানুষ চরে ফিরে যায়। ধনী বা ভদ্র লোকেরা সেখানে যেয়ে বসববাস করলে সম্মান থাকে না। এই সম্মানহানীর ভয়ে তারা চরে ফিরে যান না। এমনকি ভৌত অবকাঠামো গড়ে ওঠার পরেও অনেকে আর ফিরতে আগ্রহী হন না।

তাই নতুন চরে যাওয়ার সঙ্গে সম্মানের প্রশ্নটি জড়িত থাকে। নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের কাছে যেখানে ভৌত অবকাঠামো না থাকাটাই প্রধান, সেখানে উচচ শ্রেণীর কাছে সম্মানের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

উচচ শ্রেণীর কেউ চরে ফিরে যেতে চায় না ঠিকই, কিন্তু নতুন চর দখলে রাখতে চায়। বিশেষ করে নতুন চরে যে সমস্ত Settlement কর্মসূচী নেয়া হয়, তাকে ঘিরে চলে নানা ক্ষমতার লড়াই নিজস্ব অনুসারী গ্রুপ গড়ে তোলা, চরে নিজের আধিপত্য বজায় রাখা এবং ভোট ব্যাংক গড়ে তোলা এসব Settlement কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

বর্তমানে হরিরামপুর থানার ল্যাছড়াগঞ্জ ইউনিয়নের নতুন জেগে ওঠা চরগুলিতে বিভিন্ন আশ্রয়ন প্রকল্প গড়ে তোলা হচেছ । কোথাও কোথাও ADB'র (ASIAN DEVELOPMENT BANK) আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামোও নির্মিত হচেছ। এই আশ্রয়ন প্রকল্পগুলি বর্তমান সরকারের ভোট ব্যাংক হিসাবে কাজ করবে - এই উদ্দেশ্যেই সেখানকার ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা সেগুলি তৈরী করছেন। প্রতিটি আশ্রয়ন প্রকল্পে সরকার সমর্থক গোষ্ঠীগুলি নিজেদের অনুসারীদের আশ্রয় দিয়ে আগামীতে তাদের ভোট নিশ্চিত করে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচেছ, কোন চরেই ক্ষমতাশালী কোন ব্যক্তিকে থাকতে দেখা যায়নি। কিন্তু নিজস্ব অনুসারীদের চরে তুলে, চরের উপর দখল তারা ঠিকই জোর রেখেছেন।

নতুন জেগে ওঠা চরে দখল বজায় রাখার অন্যতম একটি প্রক্রিয়া হচেছ সরকারী অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করা। কোন এলাকায় যখন চর জেগে ওঠে তখন সেখানে সরকারের অনুমতি ছাড়া কেউ বসতি তৈরী করতে পারে না। কিন্তু এলাকার প্রভাবশালী গোষ্ঠী যাদের সাথে সরকারের সম্পর্ক থাকে তারা ভূমি

মাপজোখের সময় প্রভাব খাটিয়ে চরের দখল নিয়ে নেয়। সেই সাথে সরকারের আশ্রয়ন প্রকল্পগুলিতেও তারা নিজস্ব আধিপত্য বজায় রাখে।

নতুন চর জাগার পর সরকারের ভূমি অফিস থেকে "সার্ভেয়ার" ও অফিসার নতুন চরে যান জমি মাপজোখ করতে। তাদের সহায়তায় ধনী মালিকরা নিজেদের জমির অবস্থান ঠিক করে নেন। যদিও নতুন জেগে ওঠা অধিকাংশ জমিই "খাস সম্পত্তি" হিসাবে সরকার অধিগ্রহণ করে নেন। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে নতুন করে আইন জারী করা হয় যে ১৯৯৪ সালের পূর্বে যেসব চর নতুন করে জেগেছে সেগুলি খাস হিসাবে গণ্য হবে। ১৯৯৪ সালের পরে জেগে ওঠা জমি তার বৈধ মালিক ফেরৎ পাবে। যদিও শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের আমলে নিয়ম ছিল , পদ্মায় বিলীন হওয়ার ৮ বছরের মধ্যে জমি বা চর জাগলে সেখানকার জমিপূর্বের মালিক ফেরৎ পাবে। কিন্তু ৮ বছরের পর চর জাগলে সেখানকার জমি খাস হিসাবে সরকারী সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হবে।

সরকারের এসব আইনী জটিলতার কারণে অধিকাংশ জমির মালিক তার জমি হারান। বিপরীতে উচচ শ্রেণীর লোকজন জমির মালিক হয়ে ওঠেন ক্ষমতার জোরে। নতুন জেগে ওঠা চর যখন খাস হিসাবে গণ্য হয়, তখন দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঐ জমির উপর নিজস্ব অধিকার হারায়। এসব খাস জমি অধিগ্রহণ করে সরকার আবার সেখানে আশ্রয়ন প্রকল্প গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব জমি ক্ষমতাবানদের দখলে চলে যায়। এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ার কারণে এবং সরকারী অফিসে ভাল যোগাযোগ থাকার কারণে এসব খাস জমির অধিকাংশ মালিকানা উচচশ্রেণীর লোকজনই পেয়ে থাকে।

তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমি মাপজোখ করার সময় সীমানা নির্ধারণ করা দূরূহ হয়ে পড়, সীমানা নির্ধারনের জটিলতার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজের জমির পূর্ণ অধিকার পায় না। কিছু জমি ফেরৎ পেলেও অধিকাংশ জমির উপর থেকে তাদের অধিকার ছেড়ে দিতে হয়। এধরনের জটিলতার কারণে দেখা যায় নিম্ন শ্রেণীর লোকজন জমি থেকে অধিকার হারিয়ে আরো প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। বিপরীতে উচচ শ্রেণীর ক্ষমতা আরো সুসংহত হচেছ আবার তারা নতুন চরেও তাদের আধিপত্য বজায় রাখছে।

জমির দামের স্বল্পতা এবং পদ্মার নিকটবর্তী এলাকায় অভিবাসন

দরিদ্রদের পদ্মার কাছাকাছি এলাকায় অভিবাসনের অন্যতম কারণ জমির সহজলভ্যতা এবং জমির দাম ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। ভাঙ্গন কবলিত এলাকা

বলে পদ্মার খুব কাছের এলাকা গুলিতে জমির দাম থাকে খুবই কম। প্রতি শতাংশ ৫০০ টাকা থেকে সর্বোচচ ১৫০০ টাকা। কিন্তু সাভার, মানিকগঞ্জ কিংবা রাজধানী ঢাকায় এত অল্প দামে জমির কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এমনকি হরিরামপুরেরই পাশের অঞ্চল ঝিটকা, বালিরটেক প্রভৃতি এলাকাতেও জমির দাম প্রতি শতাংশ ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা। হরিরামপুর থানার জমির দাম অপেক্ষাকৃত কম থাকার কারণ প্রতি বছরই এই থানার কোন কোন ইউনিয়ন ভাঙ্গনের শিকার হচেছ । বিশেষ করে পদ্মার আশপাশের গ্রামগুলি প্রতিনিয়তই ভাঙ্গছে। ফলে যে এলাকা অল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙ্গে যাবে বলে আশংকা করা হয় তাই তার দামও কম থাকে।

এমনিতেই ভাঙ্গন কবলিত মানুষগুলি অর্থনৈতিকভাবে চরম বিপর্যস্ত থাকে। চাষের জমি, ভিটে বাড়ি, মাথা গোজার ঠাঁই সব হারিয়ে তারা দূরাবস্থার চরমে পৌঁছে যায়। তাই তাদের মধ্যে খুবই কম লোকেরই সাধ্য থাকে ৫/৬ হাজার টাকা শতাংশ দরে বা তার চেয়ে বেশী দাম দিয়ে জমি কেনা। একারণে তারা বসবাসের জন্য পদ্মা পাড়ের ভাঙ্গন কবলিত এলাকাগুলিকেই বেছে নিতে বাধ্য হয়। বেশীর ভাগ লোকই ৭/৮ হাজার টাকা দিয়ে ১২/১৩ শতাংশ জমি কিনে নতুন করে ঘর তোলে। একারণে নারায়ণকান্দি, হারুকান্দি, কাজিরপাড়া, কৈয়ের চর, বয়রা, দাশকান্দি, পিপিলা প্রভৃতি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া গ্রাম গুলি থেকে এসে মানুষ পদ্মা পাড়ের ভেলাবাদে বসবাস করছে। কারণ ভেলাবাদে জমির দাম প্রতি শতাংশ ৫০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে।

কিন্তু এই অল্প দামে জমি কেনার সাধ্যও থাকে না অধিকাংশ মানুষের। এধরনের চরম দারিদ্র পীড়িত মানুষ মূলতঃ তারাই যারা জীবনে ৩/৪টি ভাঙ্গা দিয়েছে। বারবার নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে তারা সর্বস্ব হারিয়েছে। তারা এখন কৃষি শ্রমিক থেকে দিনমজুরে পরিণত হয়েছে। এরা রাস্তা, সরকারী জায়গা বা অন্যের পতিত জমিতে এসে আশ্রয় নেয়।

অভিবাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শ্রেণীভেদে লিঙ্গীয় পার্থক্য

গ্রামের ধনী গৃহে পুরুষদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা গেছে। ভাঙ্গন কালীন সময়ে যদিও পরিবারের সকলের সাথে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তথাপি পুরুষদের ভূমিকা বা ক্ষমতা কাঠামোতে পুরুষ সদস্যদের প্রবেশাধিকারের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা ক্ষমতাশালী সকলেই

পুরুষ। নারীদের গৃহ থেকে খুব বেশী বের হতে হয় না; তারা বের হলেও একই গ্রামের মধ্যেই এই গতিশীলতা সীমাবদ্ধ থাকে। অল্প কয়েকজন নারী স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকতা করলেও তাদের বাড়ীর পুরুষ সদস্যই গ্রামের ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে জড়িত। গ্রামে বা এলাকায় তাদের সক্রিয় ভূমিকা কতটুকু তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিপরীতে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা যেহেতু কম থাকে; তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাদের উপস্থিতি থাকলেও নারীদের সক্রিয়তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। ২/১ টি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদের সক্রিয়তার ভিত্তিতেই অভিবাসনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভেলাবাদ গ্রামের নতুন পাড়ায় থাকেন জব্বার চৌধুরী; তার স্ত্রী পরিবার পরিকল্পনা অফিসে চাকুরী করেন; কিন্তু তার স্ত্রী নয়; গ্রামের ক্ষমতা কাঠমোত জব্বার চৌধুরী নিজে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখেন। এলাকায় তার নিজস্ব অনুসারীরাও রয়েছে। তাই অভিবাসনের সময় জব্বার চৌধুরীর অবস্থান প্রধান ভূমিকা রাখে বিপরীতে তার স্ত্রীর অবস্থান সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি।

এছাড়াও অভিবাসনের সময় অধিকাংশ কাজ ধনী গৃহের পুরুষদেরই করতে হয়। স্থানান্তর পরবর্তী স্থান ঠিক করা, এমনকি ঘরের টিন খোলা বা নতুন ঘর তোলার সময়েও মেয়েদের অংশগ্রহণ করতে হয় না। এসময় তাদের মূলতঃ শিশুদের দেখাশোনা এবং রান্নার কাজ করতে হয়। একারণে দেখা গেছে ধনী গৃহের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখলেও নারীরা অভিবাসরেন ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে না। পুরুষ সদস্যরা সমাজে তাদের অবস্থান বা ক্ষমতা কাঠামোতে প্রবেশাধিকারের ভিত্তিতেই অভিবাসন প্রক্রিয়ার সমস্ত কাজে নিজেদের ভূমিকাকে প্রধান করে তোলে। কিন্তু বিপরীত দিকে দরিদ্র শ্রেণীর সকল নারীকেই অভিবাসনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। যেহেতু এসব পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ তাই সকল সদস্যদেরই কাজ করতে হয় টিন ভাঙ্গ, ঘর গোছানো, মালপত্র স্থানান্তর নতুন করে ঘর তোলা, রান্না, শিশুদের দেখাশোনা এ সমস্ত সব কাজে নারীদেরক্কেও অংশ নিতে হয়। যদিও দরিদ্র পরিবার গুলিতে ভাঙ্গনকালীন অবস্থায় বিভিন্ন কাজ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী পুরুষের পার্থক্য থাকে তবে নির্দিষ্ট কিছু কাজ নারীদেরকেই করতে হয়। ফলে দেখা গেছে অভিবাসনের সময় নারীদেরকে সবচেয়ে বেশী কাজ করতে হয়।

উচচ শ্রেণীর ক্ষেত্রে পুরুষরাই যে সব সময় ঘর ভাঙ্গার জন্য শ্রমিকের ব্যবস্থা করে। কিন্তু ভাঙ্গন পরবর্তী স্থান ঠিক করা প্রভৃতিতে অনেক সময় উচচ শ্রেণীর নারীদের অংশগ্রহণ থাকে। তবে এগুলো হয়,

ক) বাড়ীতে পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ বাড়ীর পুরুষ যদি উপার্জনের জন্য শহরে থাকে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তখনই স্থানান্তর করতে হয় তাহলে ভাঙ্গনকালীন ও পরবর্তীতে নানা সিদ্ধান্ত পরিবারের নারী সদস্য নিয়ে থাকে। তবে সেটা একক পরিবারে দেখা যায়।

খ) পরিবারের পুরুষ সদস্য যদি দায়িত্বহীন হয় অর্থাৎ দূর্যোগ মোকাবেলায় কোন ধরণের দয়িত্ব নিতে না চায়।

গ) পরিবারে পুরুষ সদস্য না থাকলে বা দায়িত্ব নিতে পারে না এমন পুরুষ সদস্য থাকলে নারীদের নানা দায়িত্ব পালন করতে হয় দায়িত্ব নিতে হয়।

অভিবাসনের সময় উচচ শ্রেণীর নারীদের যেখানে কায়িক শ্রম কম করতে হয়, সেখানে দরিদ্র পরিবারে নারীদের কায়িক শ্রমের মাত্রা বেশী থকে। অর্থনৈতিক স্বচছলতার কারণে মিস্ত্রি বা শ্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা ধনী পরিবারের থাকে ফলে তদারকি ছাড়া তেমন কোন কাজ ধনী পরিবারের মেয়েদের করতে হয় না। সমস্ত কাজ শ্রমিকেরা করে কখনো প্রয়োজন হলে পুরুষ সদস্যরা করে। নারীদের কায়িক শ্রম না করার আরেকটি কারণ হলো সম্মানহানীর বিষয়। ধনী পরিবারের ক্ষেত্রে ঘরের বউ শ্রমিকদের সাথে এক হয়ে কাজ করে না, বা বাড়ীর বাইরে কাজ করলে সম্মান থাকে না। ঘরের বউ-ঝিদের ঘরের ভেতরের কাজ করতে হয়, কিন্তু দরিদ্র পরিবারে সেসব ক্ষেত্রে সম্মানহানীর প্রসঙ্গ অবান্তর। ভাঙ্গনকালীন জরুরী অবস্থায় যে করেই হোক ঘর-বাড়ী স্থানান্তর করতে হয়, যেহেতু অর্থ নৈতিক অসচছলতার কারণে তারা শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে না, পারলেও সংখ্যায় কম, তাই দরিদ্র পরিবারের নারীদের ঘর ভাঙ্গা, টিন খোলা, জিনিষপত্র গোছানো প্রভৃতি কাজ পুরুষ সদস্যদের সাথে হাত মিলিয়ে করতে হয়। পাশাপাশি ঘরের অন্যান্য নিয়মিত কাজও করতে হয় সম্মানের প্রসঙ্গ তখন জরুরী হয়ে ওঠে না জরুরী হয় বেঁচে থাকার প্রসঙ্গ।

কাঠাপাড়ার একজন দরিদ্র শ্রমিক বলেছেন, *"সে সময় (ভাঙ্গনকালীন সময়) সবারই হাত লাগানো লাগে, হুড়োহুড়ির সময় কোন নারী পুরুষ ভেদ নাই। ঘরের সবাইকেই কাজ করা লাগে। কারণ পদ্মার সাথে কোন মাতবরী নাই। মাতবরী খাটবেও না, চুলায় ভাত দিছেন, তখনই ফাটল দেখা দিল গেল সব ভাত ফেলে সঙ্গে সঙ্গে কাজে ছোটা লাগবে। ঐ ভাত তো পদ্মায় যাইবো।"*

আরেক জন দিনমজুর বলেছেন, *"পদ্মায় যখন ভাঙ্গন তখন বাচচা কি আর মাইয়া কি সবতেরে তখন কাজ করণ লাগবো, ঘর সরানো লাগবো ঘরের জিনিষ বান্ধা লাগবো। হাড়ি পাতিল বিছানা বালিশ কোন কিছুই বাদ নাই এমন সময়ও গেছে ঘরের বউগো টিন মাথায় কইরা দুই মাইল হাটটা যাওন লাগছে"।*

পদ্মায় ভাঙ্গনের সময়টা এখানকার অধিবাসীদের জন্য সবচেয়ে বিপদজ্জনক সময়, এসময় ঘর-বাড়ী ও মালপত্র সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়াই প্রধান কাজ। এই অভিবাসন কালীন ব্যস্ততার সময়গুলিতে ঘরের কোন সদস্যই বসে থাকে না কোন কোন দরিদ্র পরিবার হয়তো অল্প কিছু দিনমজুর (স্থানীয়দের ভাষায় কামলা বা জুগাইল্যা) নিয়োগ করে কিন্তু তারপরেও পরিবারের কোন সদস্য বসে থাকতে পারে না সবাইকেই কাজ করতে হয় ঘরের মেয়েদের তখন রান্না করতে হয়, বাচচা দেখাশোনা করতে হয়, এসব কিছু সামলিয়ে তাদের গৃহ স্থানান্তরের কাজ ও করতে হয়। কখনো কখনো নতুন ঘর তোলার সময় মেয়েদের সারাদিন মাটিও কাটতে হয়। তাদের রান্না বা খাওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময়ও থাকে না। তখন পান্তা, চিড়া, জাউ প্রভৃতি খেয়ে দিনযাপন করেন। কখনো এক বেলা রেঁধে তিন বেলা খেতে হয়। অভিবাসন কালীন সময়ে এই প্রচণ্ড ব্যস্ততার উল্লেখ করে জেলে পাড়ার একজন নারী বলেন, *"হে সময় ঘরের বউদের রান্না করা লাগছে, কোলের বাচচা দেখতে হইছে আবার ঘর ভাঙ্গা, টিন খোলা ও নামানো, কাঠ সরায়ে রাখা, লাকড়ি গোছানো, মালপত্র বান্ধা, ঘরের জিনিষ সরানো এই সকল কাজও করতে হইছে। কামের চোটে মাথা ঠিক থাকে না। হাতের জিনিষ আর হাতের কাছে থাকে না সব আউলা হইয়া যায়, নুনের বয়ামটাও খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হইতে হয়, শরীলে কুলায় না তবুও সব জিনিষ ও ঠিক রাখন লাগে।"* এই ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, *"ভাঙ্গন যখন শুরু হয় তখন মাইয়া মানুষের গুয়ায় থাকে না কাপড়, পেটে থাকে না ভাত আর মাথায় থাকে না ত্যাল।"*

তাই দেখা যায়, নারীর ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজন শ্রেণীগত অবস্থান দূর্যোগ মোকাবেলা ও বিভিন্ন কার্যাবলীতে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। ভাঙ্গন কালীন সময়ে দেখা যায় নারীর প্রথাগত দায়িত্বের পাশাপাশি বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হয়, নারীর ফলে লিঙ্গীয় পরিচিতি তাকে অনেক ক্ষেত্রে নাজুক করে তোলে। সাধারণ জীবন যাত্রায় নারীর কায়িক শ্রম বা গৃহের বাইরের শ্রম দানের অনুমতি না থাকলেও দূর্যোগ কালীন সময়ে পরিবার তার এই সাহায্যকে স্বাগত জানায় যা নারীর দক্ষতা, শক্তিমত্তা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে। তবে এটা দেখা যায় শুধুমাত্র নিম্ন শ্রেণীর বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রে। প্রত্যেকে এই বিশেষ মূহূর্তে

ভাড়া করা সিদ্ধান্ত যেমন নেতে পারে না সেই সাথে সরাসরি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথা অভিবাসনকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে না।

রাস্তায় অভিবাসন এবং রাস্তায় থাকা

গবেষিতদের কাছে *"রাস্তায় থাকি"* কথাটি বিশেষ অর্থ বহন করে। তাদের কাছে রাস্তায় থাকা সম্মানহীনতা ও নিরাপত্তাহীনতার অপর নাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা থাকার মতো কোন আশ্রয় গ্রামে পায়, ততক্ষণ তারা রাস্তায় আসতে চায় না। রাস্তা হচেছ তাদের কাছে শেষ জায়গা, *"যার কোন থাকার জায়গা নেই, সেই তো যায় রাস্তায়"*, রাস্তায় থাকা একই সঙ্গে সম্মানহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং হীনমর্যাদা প্রকাশ করে। বর্তমানে ভেলাবাদ গ্রামে বসবাসরত একটি পরিবার আগে হারুকান্দি গ্রামে থাকতো। হারুকান্দি গ্রাম ভেঙ্গে গেলে তারা প্রথমে ভেলাবাদ গ্রামের রাস্তায় এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এই পরিবারটির একটি মেয়েকে, যার তখন বিয়ের কথা হচিছল, পরিবারটি তার ফুফুর বাসায় রেখে আসে। রাস্তায় থাকলে মেয়েটির *"ভালো ঘরে"* বিয়ে হবে না, তার নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে। একারণে ঐ পরিবারটি দীর্ঘদিন রাস্তায় থাকলেও বিয়েরযোগ্য মেয়েকে রাস্তায় রাখতে চায়নি। তাদের কাছে রাস্তায় থাকা চরম অসম্মানের একটি বিষয় ছিল। তাই নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে দরিদ্র মানুষেরা গ্রামেই থাকতে চায়- রাস্তায় আসতে চায় না। কিন্তু একান্ত নিরূপায় হয়ে শেষ ভরসা স্থল হিসাবে তারা বাসস্থানের জায়গা হিসাবে রাস্তাকে বেছে নেয়। কখনও খোলা জায়গাও রাস্তা বলে বিবেচিত হয়। কেউ ১৫ বছরও অস্থায়ী রূপে সেখানে থাকলেও স্থায়ীভাবে রাস্তায় থাকতে চায় না। গৃহস্থ বাড়ীর ধনীরা কখনো রাস্তায় আসতে চায় না। কারণ এর সঙ্গে অসম্মান এবং হীন মর্যাদা জড়িত। দরিদ্ররাই রাস্তায় আসে, কারণ তাদের কাছে তখন সম্মান আর মর্যাদার আবরণ মুখ্য হয়ে ওঠে না। জীবনকে টেনে নেয়াই তাদের কাছে তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দুটি ভিন্ন শ্রেণীর ওপর নদী ভাঙ্গনের প্রভাব

পদ্মার ভাঙ্গনের ফলে ভাঙ্গন কবলিত সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধনী গরীব নির্বিশেষে সবাই কোন না কোন ভাবে আর্থিক, সামাজিক, মানসিক বা রাজনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই এলাকার মানুষ প্রধাণতঃ কৃষি জমির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ভাঙ্গনের ফলে তারা উৎপাদনের উপায় থেকে বিচিছন্ন হয়েছে

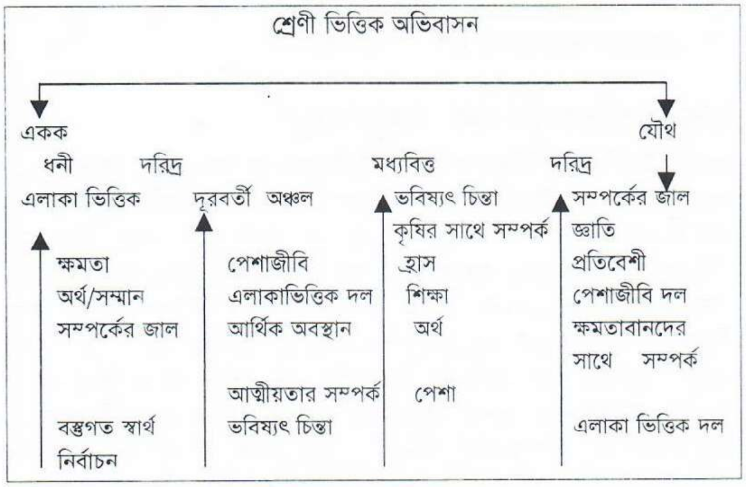

এবং এর ফলে পরিবর্তিত হয়েছে এখানকার উৎপাদন সম্পর্কেরও। গবেষিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই একটি কথা বলেছেন, *"চোরে নিলে কিছু রেখে যায়, আগুনে পুড়লে বা বোমাতে ধ্বংস হলেও অন্ততঃ মাটি টুকু রেখে যায়, কিন্তু পদ্মায় নিলে কিছুই থাকেনা। পায়ের তলে দাড়ানোর মাটি ও যদি না থাকলো তাহলে তো আপনার কোন কিছুই থাকে না"।* আবার কেউ কেউ বলেছেন, *"যার দুই বিঘা জমি ছিল, সে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ১০০ বিঘা জমি ছিল সেও তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"* কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে শ্রেণী ভেদে সবার মধ্যে এই ক্ষতির পরিমাণ সমান নয়। কারণ যার সম্পত্তির পরিমাণ ১ বিঘা বা ২ বিঘা কৃষি জমি, সে শুধুমাত্র কৃষি জমির উপরেই নির্ভরশীল ছিল। ২ / ৩ বিঘা জমি থেকে যে অল্প পরিমাণ ফসল আসে তাতে ৫/৬ সদসস্যের একটি পরিবারের কোন মতে দিন চলে যায়। সেখান থেকে সঞ্চয়ের সামর্থ খুব কমই থাকে। ফলে পদ্মার ভাঙ্গনে সে যেমন ভিটেমাটি হারা হয়, তেমনি সে তার উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন হতেও বঞ্চিত হয়। তখন বিকল্প কোন জীবিকা না থাকায় সে দিন মজুরে পরিণত হতে বাধ্য হয়। কিন্তু তার পরেও এসব দিন মজুরের বেঁচে থাকা আরও কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ ভাঙ্গন কবলিত এলাকাগুলোতে খুব কমেই কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে। আবার যে সমস্ত পরিবারের কৃষি জমি ১ বিঘা বা তারও কম (এই ধরনের পরিবারের সংখ্যাই গ্রামে বেশী) তাদের জমি যখন

পদ্মায় চলে যায় তখন তার পক্ষে রাস্তায় নামা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। কাণ্ঠাপাড়ার রাস্তার দুই পাশে যে অসংখ্য পরিবার কোনমতে ছাপড়া ঘর তুলে মানবেতর জীবন যাপন করছে তাদের প্রায় সবারই জমি ছিল ১ বিঘার কম। কারো কারো কোন জমিই ছিল না বসত বাড়ী ছাড়া। তারা অনেক আগে থেকে দিনমজুর ছিল। ফলে তারা বারবার বসবাসের জায়গা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচেছ। হাবুকান্দি ছেড়ে নারাণকান্দি রাস্তায়, সেখান লেকে মোশাররফ শিকদারের কলোনী বা মুন্নু কলোনী, সেখান থেকে ভেলাবাদ রাস্তায়, ভেলাবাদ স্কুল মাঠ, কাণ্ঠাপাড়া রাস্তা কিংবা যাত্রাপুর রাস্তা- এমনি করেই বারবার বাসস্থান পরিবর্তন করে কোন রকমে খেয়ে না খেয়ে তাদের জীবন কাটে। তাই নদী ভাঙ্গনের ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আরো প্রান্তিক হয়ে পড়ে।

টীকা

১। শ্রেণী - শ্রেণী বলতে এখানে অর্থনীতি ও ক্ষমতার সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কীত। অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ক্ষমতা কাঠামোতে প্রবেশাধিকারের ভিত্তিতে "শ্রেণী" নির্ধারিত হয়েছে, ভাঙ্গনের পূর্বে যাদের প্রচুর কৃষি জমি ও অর্থ সম্পদ ছিল এবং স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোতে উচচ অবস্থান ছিল তাদেরকে "উচচ শ্রেণী" হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কৃষি জমির উপর নির্ভরতা সত্ত্বেও যাদের পর্যাপ্ত কৃষি জমি ছিল না এবং এলাকার ক্ষমতা কাঠামোতে প্রবেশাধিকার ছিল সীমিত, তাদেরকে নিম্ন শ্রেণী ধরা হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী মূলতঃ তারাই যাদের কৃষি জমি থাকা সত্ত্বেও কৃষির উপর নির্ভরতা কমিয়ে শিক্ষকতা, চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি পেশার উপর নির্ভরতা বাড়িয়েছে। এই শ্রেণী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের উপর জোর দিয়েছে এবং স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোত এদের প্রভাব কম।

২। কলোনী - কলোনী বলতে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসরত একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝান হয়েছে যারা একজন ধনী ব্যক্তির আর্থিক ও রাজনৈতিক ছায়ায় বর্তমানে বসবাস কছে। ঐ ধনী ব্যক্তির নিজস্ব বা কিনে দেওয়া জমিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঘর তোলে এবং তার নামে এই এলাকার পরিচিতি গড়ে ওঠে। এর পাশাপাশি ঐ কলোনীর নামের মাধ্যমে ধনী ব্যক্তিটির মহিমা কীর্তিত হয় এবং তিনি সেখানে পেট্রনের মর্যাদা পান।

৩। গৃহস্থালী - গৃহস্থালী বলতে ভাঙ্গন কবলিত জনগোষ্ঠীর বসতি ও বসবাসকারীদের বুঝানো হয়েছে। সাধারণতঃ মা-বাবা, সন্তান, দাদা-দাদী প্রভৃতি সদস্যের বসবাসের ভিত্তিতে যে নির্দিষ্ট একটি পরিবার ভিত্তি গৃহস্থালীকে নির্দেশ করা হলেও এখানে তা করা হয়নি। এখানে একটি গৃহস্থালী বলতে একত্রে বসবাসরত পরিবারের সদস্যদের বোঝানো হয়েছে, যেখানে একই চুলায় রান্না হচেছ এবং খানা অভিন্ন। এই গৃহস্থালীর সদস্যরা জ্ঞাতি সম্পর্কের সূত্রে হতে পারে আবার প্রতিবেশী সম্পর্কেও হতে পারে। বিস্তারিত Harris (1994).

৪। পেট্রন ক্লায়েন্ট সম্পর্ক - এই সম্পর্কের দ্বারা একজন ধনী ব্যক্তি ও দরিদ্র একটি জনগোষ্ঠীর যৌথ সম্পর্ককে নির্দেশ করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে আর্থিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সাহায্য পেয়ে থাকে। আবার ঐ দরিদ্র

জনগোষ্ঠী ধনী ব্যক্তির ক্ষমতার উৎস রূপে কাজ করে, বিশেষ করে নির্বাচনের সময় তারা ধনী পেট্রনের ভোট ব্যাংক হিসাবে কাজ করে।

৫। ভাওর বাড়ী - ভাওর বাড়ী বলতে ফসল তোলার অস্থায়ী ঘরকে বোঝানো হয়। এটি একটি আঞ্চলিক শব্দ ধনী ব্যক্তিদের দূরবর্তী যে গ্রামে জমি থাকে সেস্থানে তারা অস্থায়ী একটি ছোট ঘর তোলেন। ১ জন বা ২ জন থাকতে পারে এমন ছোট টিনের বা বেড়ার ঘর তৈরী করা হয়। একে বলা হয় "ভাওর" করা। "ভাওর বাড়ী" তে মূলতঃ ফসল কেটে রাখা হয়। পরে সেখানের সেই ফসল নিজের বসত বাড়ীতে স্থানান্তর করা হয়।

৬। শন কুড়ালী: গবেষিত এলাকায় বর্গা প্রথায় চাষাবাদ করাকে শন-কুড়ালী বলা হয়।

তথ্যসূত্র

Harris. Olivia G. (1994) Household as a Natural Unit. In *Of Marriage and Market* , ed. K. Young et al., London: Routledge.

Torry, William I. (1979) Anthropological Studies in Hazardous Environment: Past Trends and New Horizons. *Current Anthropology*. Vol. 20: No. 3

সহায়ক গ্রন্থাবলী

আখ্তার, রাশেদা (১৯৯৫) দূর্যোগে নারী ও শিশু: একটি নৃবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা। *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা,* সংখ্যা ৩, ঢাকা: নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরগর বিশ্ববিদ্যালয়।

রহমান, আতিউর (১৯৯১) দূর্যোগ প্রতিরোধ: সম্ভাবনার দিক। *সমাজ নিরীক্ষণ,* সংখ্যা ৩৯, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খান ইসলাম মনিরুল, (১৯৯২) কৃষক সামাজিক সংগঠন ও প্রেক্ষিত / *সমাজ নিরীক্ষণ,* সংখ্যা ৪৩, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আহমেদ, হাসিনা (১৯৯৩) নদী ভাঙ্গন জনিত সংকট, মাঠ পর্যায়ের কিছু অভিজ্ঞতা। *সমাজ নিরীক্ষণ,* সংখ্যা ৫০, সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হালদার, বুমেল (২০০০) নদীভাঙ্গন: পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ও টিকে থাকার প্রক্রিয়া। *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা,* সংখ্যা ৫, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

Alam. S. M. Nurul (1992) Survival: An Analysis of General Issues and Concerns with Emphasis on the Strategies to Cope with Flood in Bangladesh. In *Environment and Natural Resource Management in*

Bangladesh, ed. Sadeque Zahir. Dhaka : Bangladesh Sociological Association.

Elahi, K. Maudood, K. Saleh Ahmed and M. Mafizuddin, eds. (1993) River Bank Erosion, Flood and Poulation Displacement in Bangladesh. River Bank Erosion Impact Study, Jahangirnagar University.

White, Gibert F. [] Natural Hazards Research: Concepts Methods and Policy Implications.